Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 325-344
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

দিনাজপুরের আর্থ–সামাজিক অবস্থা: উন্নয়ন সম্ভাবনা

ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক *

সারকথা: *১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী দিনাজপুর জেলা। ১৯৮৪ সালে বর্তমান দিনাজপুর জেলার আধুনিক রূপান্তর ঘটে। বেদানা লিচু আর কাটারিভোগ চালের জন্য খ্যাত দিনাজপুরের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। অতীতে, অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ বা জোতদার শ্রেণির মানুষের গোলাভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ ছিলো ঠিকই। ফসলের দাম হ্রাস–বৃদ্ধির সাথে রায়ত শ্রেণির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতো। কিন্তু, অধিকাংশ জনগণ, যারা দরিদ্র ও ভূমিহীন সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো না। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলা জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ এবং তা কার্যকর হলে ১৯৫৬ সাল থেকে জমিদারী স্বত্বের বিলুপ্তি ঘটে। এ সময়কাল থেকে কৃষি উৎপাদনে ও ভূমি মালিকানায় যে পরিবর্তন তার সূচনা ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে কৃষি সমৃদ্ধ একটি জেলা হিসাবে দিনাজপুর উত্তরাঞ্চলের শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাতি লাভ করে। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ, সার, সেচ, কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে কৃষিক্ষেত্রে শস্য বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। জীবন নির্বাহী চাষাবাদের স্থলে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার ঘটে। ফলে, কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়তে থাকে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দিনাজপুর অঞ্চলে শিল্পখাতের বিকাশ তেমন হয়নি। ধানের সহজলভ্যতা ও সস্তা শ্রমের পর্যাপ্ত যোগানের কারণে এখানে চালকলের সংখ্যা বেশি। গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারগুলোতে কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাধান্য রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে শিল্প বলতে অন্য যা কিছু হয়েছে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বলা যায়। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পপণ্যের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দিনাজপুর থেকে ধান, চাল, আম, লিচু, কাঠাল, ভুট্টা, টমেটো ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি হচ্ছে। আপেক্ষিকভাবে পূর্বের তুলনায় ক্রমান্বয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ কমে গিয়ে তার স্থলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার, জনগণের সচেতনতা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের প্রাপ্যতা বেড়েছে। কালক্রমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিছু মানুষ শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এ জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারের নিজস্ব অর্থনৈতিক সংস্কৃতি পূর্বে বিদ্যমান ছিলো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন কারণে তারা সেগুলো হারিয়ে ফেলছে। ক্ষেত্র ভেদে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরির বৈষম্য রয়েছে। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক অবকাঠামোর ভিত্তি গড়ে উঠেছে। উন্নত চিকিৎসাসেবা, স্যানিটেশন সুবিধা, পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা*

* সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি, উপ সচিব (প্রেষণে) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজজীবনে উন্নয়নের মিশ্র প্রভাব লক্ষণীয়। আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কতগুলো সূচকে ধনাত্মক পরিবর্তন সাধিত হলেও কোন কোন সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে অবনতি লক্ষ করা যায়। দিনাজপুর অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে পর্যটন শিল্প বিকাশের এবং উন্নয়নের আছে যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এ জেলার রাস্তাঘাট, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। শিল্পের উন্নয়নে এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা শ্রেণিকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

১. ভূমিকা

কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য সেই অঞ্চলের মানুষের আয়, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রকৃতি ও পরিমাণ, সম্পদের প্রাচুর্য ও মালিকানা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, পেশা, আবাসন, বহির্গমনের হার, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন গতিশীল সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, পেশা, সম্পদের মালিকানা ও তার ব্যবহার, উপজীবিকা ও আয়ের উৎসসমূহের পরিবর্তন ঘটে, যার কারণে মানুষের জীবনযাপনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। এই বৈচিত্র্য ও ধনাত্মক পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। ফলে, তা মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উন্নয়নের সূচনা ঘটায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সমষ্টি হচ্ছে উন্নয়ন । এটি একটি দীর্ঘকালীন গতিশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, সমাজে বসবাসকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ধনাত্মক পরিবর্তন, বিজ্ঞান মনস্কতা এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পেলে সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। উন্নয়নের একটি গুণগত অর্থাৎ মানবিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। উন্নয়ন সর্ব মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। ফলে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের নিপীড়ন থেকে সমাজ ক্রমান্বয়ে মুক্ত হতে থাকে। উন্নয়নের ছোঁয়া মানুষের মর্যাদাবোধ ও পছন্দের স্বাধীনতাকে বাড়িয়ে দেয়। মানবসম্পদের উন্নয়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ সুরক্ষাকেও উন্নয়নের সূচকরূপে বিবেচনা করা হয়। উন্নয়নের এসকল বৈশিষ্ট্য, সূচক ও পরিমাপককে সামনে রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দিনাজপুর জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

দিনাজপুর জেলা ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। ১৮০৭-১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিলটন বুকাননের বিবরণ থেকে এ জেলার আয়তন ৫৩৭৪ বর্গমাইল বলে জানা যায়। ১৮৭২ সালের লোকগণনা অনুযায়ী দিনাজপুরের লোকসংখ্যা ছিল ১৫০১৯২৪ জন। ১৯৮৪ সালে বর্তমান দিনাজপুর জেলার আধুনিক রূপান্তর ঘটে। দিনাজপুর জেলার বর্তমান মোট আয়তন ৩৪৪৪.৩০ বর্গ কিলোমিটার (১৩২৯.৮৫ বর্গমাইল), যার মধ্যে ৭৮.৮৭ বর্গ কিলোমিটার (৩০.৪৫ বর্গমাইল) বনভূমির আওতাধীন। উপজেলার সংখ্যা ১৩ টি, ইউনিয়ন ১০১ টি, মৌজা ১৯২৬ টি, গ্রাম ২১৩১ টি, পৌরসভা ০৮ টি, ওয়ার্ড ৭৫ টি এবং মহল্লার সংখ্যা ২৪৬টি। ২০০১ সালে এ জেলার জনসংখ্যা ছিল ২৭,৬৬,০০০ জন এবং ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৯০১২৮ জন হয়। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২।[১]

আবহমানকাল ধরে দিনাজপুর একটি কৃষি নির্ভর জেলা। এখানকার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক।

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২, পৃ. ১০-১৮।

কৃষিখাতকে এই জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ বলা যায়। এর প্রায় পুরোটাই সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত। অতীতে নদী সমৃদ্ধ দিনাজপুরের বহুবিধ ফল ও ফসলের মধ্যে ধানই ছিল প্রধান কৃষি পণ্য। মৌসুমি ফল গোপালভোগ আম ও বেদানা লিচু উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত দিনাজপুর। যার জন্য দিনাজপুরকে রাজশাহী বিভাগের রত্নখনি বলা হত। এতদসত্ত্বেও, দিনাজপুরের সাধারণ মানুষের কৃষিনির্ভর অতীত অর্থনেতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনের চিত্র কঠিন বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে দিনাজপুরের ভূমি মালিকানার প্রকৃতি, চাষীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, চাষ ব্যবস্থা বা ভূমি বন্দোবস্তের স্বরূপ, খাজনা, কৃষকের ঋণগ্রস্ততা, দারিদ্র্য, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, নিপীড়ন এবং তা থেকে মুক্তির জন্য দরিদ্র মানুষের আন্দোলন ও দীর্ঘ সংগ্রামের যে বিবরণ পাওয়া যায়– অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে তা এককথায় হতাশাব্যঞ্জক ছিলো।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে[২] দিনাজপুরে জমিদারের সংখ্যা বাড়ে । কারণ, যে রাজস্ব আদায়কারীরা নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তারাই কালক্রমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূস্বামী বা প্রকৃত মালিকে পরিণত হন। বিশ শতকের প্রথম দিকে কেবল দিনাজপুরে জমিদারের সংখ্যা ছিল ৪৯ জন।[৩] জমিদার ও তালুকদার ছাড়া অন্যান্যরা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার, রায়ত, অধীনস্ত রায়ত, গাতিদার, পওনিদার, মণ্ডল, ইত্যাদি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ। নির্দিষ্ট আয়, নিরাপদ বিনিয়োগ এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য তারা মূলত জমিদারি ক্রয় করতেন এবং তা দিয়ে নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করতেন। এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই কম এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো। তাদের অনেকেই উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ বা জোতদার শ্রেণির মানুষের গোলাভরা ধান এবং পুকুরে মাছ ছিলো ঠিকই। তাঁদের জীবন ছিলো সুখের। ফসলের দামহ্রাস–বৃদ্ধির সাথে রায়ত শ্রেণির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতো। কিন্তু, অধিকাংশ জনগণ, যারা দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো না। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনও ছিলো সুদূরপরাহত।

কৃষিব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো বর্গাচাষ বা ভাগচাষ ব্যবস্থা। ভাগচাষ পদ্ধতিতে উৎপাদনের অর্ধেকই জোতদারকে পরিশোধের কারণে কৃষকেরা আর্থিকভাবে তেমন লাভবান হতেন না। কৃষির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য ভূমির মালিক বা উপস্বত্বভোগীদের কেউই উৎসাহিত ছিলেন না। খাইখালাসী প্রথার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের জন্য কৃষকেরা নিজের জমি ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখত। ঐ মেয়াদে ঋণদাতা জমির উপস্বত্ব ভোগ করার পর ঋণ পরিশোধ হলে কৃষক তার জমি ফেরত পেত। চাষিদের উপর জমিদার, মহাজনদের অত্যাচার ছিল দুর্বিসহ। জমিদাররা এক টাকা খাজনার সাথে আরও দুই টাকা অন্যান্য অযৌক্তিক আদায় বুঝে নিতেন। সরকারি ভাষায় যা 'আবওয়াব' বলে পরিচিত ছিল। দিনাজপুরে কৃষকদের ভাষায় যাকে বলা হত 'বাজনা'। তহরি, হিসাবানা, পার্ব্বনী, পুন্যাহ খরচ, পস্তা, মারুচা (বিবাহকর), হাড়পুড়ালি, তলবাণি, দর্শণী বা নজরানা ইত্যাদি বিচিত্র নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হত।[৪] যে কারণে খাজনার চেয়ে 'বাজনা' বেশি কথাটার প্রচলন দেখা যায় সর্বত্র। কোম্পানি আমলের রাজা দেবী সিং (কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত) ইতিহাসের একজন অত্যাচারী, জঘন্য চরিত্রের শাসক ছিলেন।[৫] কৃষকের উপর যত সমস্ত অনাচার-অত্যাচার করা হত সেসবের বিরুদ্ধে কৃষক কোন আইনের আশ্রয় নিতে পারত না। অথচ,

[২] ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.। ১৫৭৬ থেকে ১৫৮০ সালের মধ্যে বাংলা সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে।

[৩] ধনঞ্জয় রায়, বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন (কলকাতা: পুনশ্চ, ডিসেম্বর ১৯৯৭), পৃ. ৯.

[৪] তদেব, পৃ. ১১।

[৫] মেহরাব আলী, দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস (দিনাজপুর, মে ১৯৬৫), পৃ. ১১-১২।

জমিদারের সকল কাজই ছিল আইনসঙ্গত। জমিদারদের অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে প্রজাসাধারণ সুদি মহাজনের স্মরণাপন্ন হতেন এবং মহাজনের ঋণের ফাঁদে পড়ে নিঃসম্বল হয়ে পড়তেন।

অতীতে জমিদার, সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যে কয়েকটি গণমুখী আন্দোলনের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে ছত্রিশ জাতি বা ছত্রিশ গ্রামের আন্দোলন (১৯২১-২৭), রাজবংশী কৃষকদের গাছক-াটা আন্দোলন (১৯২৪-২৫), কর বন্ধ আন্দোলন (১৯২৭-২৮), চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন (১৯২৪-৩২) ইত্যাদি। এসব আন্দোলন, সংগ্রাম করতে গিয়ে কৃষকদেরকে জেল, জুলুম ও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। তবে, অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে সহায় সম্বলহীন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাই তাঁদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তার ফলে কৃষকদের মধ্যে গণজাগরণের উন্মেষ ঘটে। অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, উনিশ শতকের সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বিশ শতকের রায়ত বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন[৬] সুস্পষ্টরূপে অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

মুঘলদের আমলে আকস্মিক মহামারী এবং পলাশীর পরে ছিয়াত্তরের (বাংলা ১১৭৬ সালে, ১৭৬৯-১৭৭০ খ্রি.) মন্বন্তর এ অঞ্চলেও ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। এ অঞ্চলের মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য শাষকগোষ্ঠীর তেমন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায় না। উপরন্তু, বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করার জন্য নবাব[৭] আদেশ জারি করেছিলেন যে, দিনাজপুরে যেটুকু চাল রয়েছে তা ক্রয় করে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে। মানুষের তৈরি সংকটের সাথে যোগ হতে দেখা যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। দিনাজপুর জেলায় খরা, বন্যা ও ফসল নাশের মত ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট দুরবস্থার উদাহরণ বিরল নয়। ১৮৬৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষকে অন্তত ০৭ বার খরা, ০৭ বার বন্যা ও ছোট বড় ০৪ টি দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হয়।[৮] ১৯৪৩ (১৩৫০ বংঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ছিলো সর্বাধিক ভয়াবহ। অমর্ত্য সেন, বি.এম. ভাটিয়া, পল.আর. গ্রিনো প্রমুখ মনে করেন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিলো বাংলার কৃষক, কারিগর ও শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘকালের দারিদ্র্য এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাব বা তার ক্রমাবলুপ্তি। জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম আর্থিক সঙ্গতি থাকা দরকার, সাধারণ দরিদ্র মানুষের হাতে তা ছিল না। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী যে দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৮৮ সালে যে বন্যা হয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দিনাজপুরের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও তার বিরূপ প্রভাব পড়ে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনায় পরিবর্তন, অগ্রগতি ও অর্জন

তৎকালীন কৃষক সমাজের মুক্তির জন্য শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাংলার কৃষি অর্থনীতির সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি ল্যান্ড রেভেন্যু কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৪০ সালে ২১ শে মার্চ কমিশন তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে আটটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল। কৃষির উন্নতির জন্য এই প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সমস্যা জর্জরিত প্রজাসাধারণের ভাগ্য ফেরাতে তা যথেষ্ট ছিল না। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলা জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ এবং তা কার্যকর হলে ১৯৫৬ সাল থেকে জমিদারী স্বত্বের বিলুপ্তি ঘটে। এ সময়কাল থেকেই কৃষি উৎপাদনে ও ভূমি মালিকানায় যে পরিবর্তন তার সূচনা ঘটে বলা যায় । ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি সমৃদ্ধ একটি জেলা

[৬] ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, দিনাজপুরের ইতিহাস (ঢাকা: গতিধারা, এপ্রিল ২০১০), পৃ. ৮৯।

[৭] নজম উদ্দৌলা, মীরজাফর পুত্র।

[৮] ধনঞ্জয় রায়, বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন, পৃ. ১৭।

হিসাবে দিনাজপুর জেলা উত্তরাঞ্চলের শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারি প্রতিবেদনে দিনাজপুরকে একটি খাদ্য ঘাটতি মুক্ত এলাকা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ, সার, সেচ, কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে কৃষিক্ষেত্রে শস্য বহুমুখীকরণ ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকের আয় বাড়তে থাকে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষণীয় হয়ে উঠে। বর্তমানে দিনাজপুর জেলা দেশের একটি অন্যতম খাদ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল। দিনাজপুর জেলার কৃষি বিষয়ক কিছু তথ্য টেবিল ১ এ উল্লেখ করা হলো।

টেবিল-১ : দিনাজপুর জেলার কৃষি বিষয়ক তথ্য (২০১৩-১৪)

ক্র: নং	বিষয়	পরিমাণ	শতকরা হার
১.	জেলার আয়তন	৩৪৩৭৯৮ হেক্টর	
২.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	২৮৫১০০ হেক্টর	৮২.৯২%
	(ক) এক ফসলি জমি	৬৯২০ হেক্টর	২.০৪%
	(খ) দুই ফসলি জমি	১৮৫২০০ হেক্টর	৬৫%
	(গ) তিন ফসলি জমি	৯১০৭০ হেক্টর	৩২%
	(ঘ) তিনের অধিক ফসলি জমি	১৯১০ হেক্টর	০.৬০%
৩.	শস্য নিবিড়তার হার		২৩০%
৪.	(ক) মোট পরিবারের সংখ্যা	৬৬২৬৭৭ টি	
	(খ) কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৪৯৫৬৫০ টি	৭৫%
	(i) ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা	১৩৪৬৭০ টি	২০.৪%
	(ii) প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা	১২৫৩০০ টি	১৯%
	(iii) ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সংখ্যা	১২২৬০০ টি	১৮.৫%
	(v) মাঝারি কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৬৫৬২০ টি	১০%
	(vi) বড় কৃষক পরিবারের সংখ্যা	১৫৯৪৫ টি	২.৪%
	(vii) বর্গাচাষি কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৩১৫১৫ টি	৪.৭%
	(গ) কৃষি বহির্ভূত পরিবারের সংখ্যা	১৬৭০২৭ টি	২৫%
৫.	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন	১৪৮৬৬৬৭ মে: টন	
৬.	বীজ ও অন্যান্য ব্যবহার বাদে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য	১৩২৩১৩৪ মে: টন	
৭.	খাদ্য চাহিদা	৫১৪৮৪২ মে: টন	
৮.	উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য	৮০৮২৯২ মে: টন	

উৎসঃ শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ ও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, "*দিনাজপুর জেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি*", খামারবাড়ি, দিনাজপুর, তারিখঃ ১৫ মে ২০১৪।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে ১৪৮৬৬৬৭ মেঃ টন, খাদ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৮০৮২৯২ মেঃ টন। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২০.৪%, ১৮.৫% ও ১৯%। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেও পরিবর্তন ঘটেছে। তিন ফসলি জমির পরিমাণ বেড়েছে যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কৃষিক্ষেত্রে শস্য নিবিড়তার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সময়কালে দিনাজপুরে শস্য নিবিড়তার হার ২৩০% উন্নীত হয়েছে। শস্যের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। আদিম চাষপদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন নির্বাহী চাষাবাদের স্থলে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার ঘটছে।

সাধারণভাবে ধান, গম, আখ, পাট, আলু, শাকসবজি, রসুন, পিঁয়াজ, তৈলবীজ দিনাজপুরে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে প্রধান ফসলাদি হলেও দিনাজপুরের কৃষি বর্তমানে ধান, আখ, ফলমূল ও গম চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভূট্টা, কলা, ডাল, কুল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো ইত্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ফলমূলের মধ্যে সুমিষ্ট বেদানা লিচু প্রধান। বোম্বাই, মাদ্রাজি, চায়না থ্রি জাতের

সুমিষ্ট লিচুও দিনাজপুরে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আমের মধ্যে মিসরিভোগ, গোপালভোগ ও সূর্যাপুরির নাম উল্লেখযোগ্য। ফলমূলের আধুনিক চাষাবাদের প্রসার ঘটছে, বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হচ্ছে আম, লিচু, কুল ও কলার বাগান। সুগন্ধি কাটারীভোগ চাল ও কাটারীভোগ চিড়া দেশের বাহিরে বিদেশেও দিনাজপুরের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। স্বর্ণালি রঙের বিখ্যাত কাটারিভোগ ধানসহ এ অঞ্চলে নানান জাতের ধান উৎপাদিত হয়। যেমন– জিরা কাটারী (চিনি গুড়া), ফিলিপিন কাটারী, বাদশা ভোগ, কালোজিরা, চিনি কাটারী ইত্যাদি।

১৯৭১ এর পর কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সরকারের নানামুখী উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষির ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দিনাজপুরের কোন কোন উপজেলায় আন্তঃশস্য উৎপাদন এবং সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হওয়ায় কৃষিতে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে হাঁস-মুরগি এবং গবাদিপশু পালন, এমনকি দুগ্ধ উৎপাদনে বেশ কিছু বাণিজ্যিক খামারও গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কৃষি কাজ ছাড়াও অকৃষি খাতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের মানুষের আয় বৈষম্য কমেছে। কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেক মানুষের হাতে কিছু না কিছু ক্রয়ক্ষমতা বিদ্যমান। ফলে বিশেষ কঠিন কোন দৈব দুর্বিপাকে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত না খেয়ে মানুষের মৃত্যবরণ করার মত পরিস্থিতি আর নেই।

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন

দিনাজপুর জেলার জনমানুষের জীবিকার উৎস প্রধানত কৃষি। স্বাধীনতার পূর্বে সেতাবগঞ্জ চিনিকল ছাড়া দিনাজপুর অঞ্চলে তেমন কোন বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে দেখা যায় না। দিনাজপুরের হাজী আব্দুর রউফ ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে ফিরে দিনাজপুরে বেঙ্গল টেকনো কেমিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি ঔষধ কারখানা স্থাপন করেন।[৯] স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়। ২০০৮ সাল থেকে মিলটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দিনাজপুর অঞ্চলে শিল্পখাতের বিকাশ তেমন হয়নি। ধানের সহজলভ্যতা ও সস্তা শ্রমের পর্যাপ্ত যোগানের কারণে এখানে চালকলের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারগুলোতে কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাধান্য রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে শিল্প বলতে অন্য যা কিছু হয়েছে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বলা যায়। বর্তমানে কৃষিভিত্তিক কিছু শিল্প কারখানা চালু হতে দেখা যাচ্ছে। আলু সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি হিমাগার স্থাপিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অনেকসময় এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প বলতে অটো রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল ইত্যাদিকে বুঝান হয় । নিম্নে দিনাজপুরের শিল্প কারখানার একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

টেবিল ২ : দিনাজপুর জেলার শিল্প ও কারখানার তালিকা

বড় শিল্প ও কারখানা	
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১টি
লোকমোটিভ কারখানা	১টি (পার্বতীপুর)
চিনিকল	১টি (সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ)
টেক্সটাইল মিল	১টি
মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা	
অটোমেটিক চাউল কল	৬১টি
সেমি অটোমেটিক চাউল কল	৩৫টি
চাতাল চাউল কল	১৮৬১টি

[৯] মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র-৫* (দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-দিনাজপুর, বাংলাদেশ, ২০০২), পৃ. ১৫৮-১৫৯।

মেজর চাউল কল	১২টি
অটোমেটিক ফ্লাওয়ার মিল	৬টি
হিমাগার	১৩টি
জুট মিল	১টি
গার্মেন্টস	১টি
মিশ্র সার ফ্যাক্টরি	১টি
পোলট্রি হ্যাচারী	৪টি

উৎস: *dcdinajpur.gov.bd*, Government Website (accessed on 21.06.2014).

উপরের ২ নম্বর টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, দিনাজপুরে ০১ টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ০১ টি লোকমোটিভ কারখানা, ০১ টি টেক্সটাইল মিল, ০১ টি গার্মেন্টস এবং ০১ টি মিশ্র সার ফ্যাক্টরি ছাড়া বাকি সব শিল্প কারখানা কৃষি নির্ভর। দিনাজপুরের কৃষি নির্ভরতা থেকে ম্যানুফেকচারিং শিল্প ও সেবা শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণ অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও বাণিজ্যিক জ্বালানী সরবরাহের নিশ্চয়তা। যৌক্তিক মূল্যে নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক জ্বালানী পেতে হলে দিনাজপুরে কয়লার সর্বোচ্চ উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তা করা সম্ভব। নিচের ৩ নম্বর টেবিলে দিনাজপুরের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ লক্ষণীয়।

টেবিল ৩ : প্রাকৃতিক সম্পদ

শিরোনাম	অবস্থান	খনি আবিষ্কার	খনি এলাকার আয়তন	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু	উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রতিদিন
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)	পার্বতীপুর উপজেলা	১৯৮৫ খ্রি.	০৩ বর্গ কি: মি:	২০০৫ খ্রি.	৬৪ মিলিয়ন মে:টন	৩৩০০ মে:টন
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)	পার্বতীপুর উপজেলা	১৯৭৪ খ্রি.	১.২০ বর্গ কি: মি:	২০০৭ খ্রি.	১৭৪ মিলিয়ন মে:টন	৫৫০০ মে:টন

উৎস: *dcdinajpur.gov.bd*, Government Website (accessed on 21.06.2014).

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবাখাতের উন্নয়ন

দিনাজপুরবাসীর কৃষিনির্ভর মনোভাবের পরিচয় প্রায় সর্বজনবিদিত এবং তা এই অঞ্চলের ইতিহাসেও নানাভাবে বিধৃত রয়েছে। কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদন ভাবনার কারণে পূর্বে এ অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে একটি বণিক গোষ্ঠী ও শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধির বিষয়টি খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। দেশবিভাগের পরিবর্তী সময়ে স্থানীয় অধিবাসিদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এ অঞ্চলে মাড়োয়ারী বণিকদের আগমন ঘটতে থাকে। বলা যায় যে, প্রায় দেশ বিভাগকাল পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল মুনাফা কেন্দ্রিক যা তাদেরকে কেবল একটি উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা যে অর্থ উপার্জন করেছিল তা স্থানীয় উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়নি। তাদের ব্যবসায়িক শোষণ ও সম্পদ আহরণ এতদঞ্চলের আপামর জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতির উপর প্রভাব ফেলেনি।[১০] দেশবিভাগ পরবর্তীকালে কয়েকটি হিন্দু ব্যবসায়ী পরিবার

[১০] *তদেব*, পৃ. ১৪৮-৪৯।

এবং মুসলমান ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ক্রমশ: হোটেল ব্যবসা, ঔষধের দোকান, মুদিখানা, প্রেক্ষাগৃহ, ছাপাখানা, ঠিকাদারি ব্যবসাসহ নানা ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। কালক্রমে এ প্রক্রিয়া প্রসার লাভ করায় দিনাজপুরবাসীর কৃষিকেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে তা পেশাগত পরিবর্তনের গতিকে সচল করে দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দিনাজপুর অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্পপতি, আমাদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানটি সাহায্যসহযোগিতা করে আসছে। প্রথমে দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মকাণ্ড দিনাজপুর ইনস্টিটিউটের একটি ভাড়া করা ঘরে পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী, শিল্পো উদ্যোক্তা, শিল্পপতি, আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রমুখের সহযোগিতায় মালদহপট্টি (গরুহাট্টি) এলাকায় ৭.৬২ শতক জমি ক্রয় করে ৪র্থ তলা বিশিষ্ট আধুনিক মানের চেম্বার ভবন নির্মিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তবে স্বাধীনতাত্তোরকালে এই জনপদে কৃষিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পপণ্যের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দিনাজপুরের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ধান, চাল, গম, আখ, আম, লিচু, কাঠাল, ভুট্টা, টমেটো ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

দিনাজপুর জেলায় হাটবাজার, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের বিস্তার লক্ষ্য করার মত। বর্তমানে দিনাজপুরে হাটবাজারের সংখ্যা ২৭৩ টি, শাখাসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬৮ টি, তালিকাভুক্ত এনজিওর সংখ্যা ৭৬ টি এবং স্থলবন্দরের সংখ্যা ০২ টি (হিলি-হাকিমপুর ও বিরল)। বেচা-কেনা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এসকল প্রতিষ্ঠান জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কৃষি, এসএমই, দরিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণ

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দিনাজপুর জেলার কৃষি ঋণের প্রতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকারি, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসাবে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাবের) বিভিন্ন শাখা কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ বিতরণ করে থাকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকেও কৃষকেরা ঋণ গ্রহণ করেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্থানীয় ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং গ্রাম্য মহাজন অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎস। এই ধরনের ঋণের সুদ বেশি। অভাবে পড়ে বাধ্য হয়ে কৃষকেরা অনেক সময় মাঠের ফসলের উপর আগাম ঋণ নিয়ে অত্যন্ত চড়া সুদে তা পরিশোধ করেন। তবে আপেক্ষিকভাবে পূর্বের তুলনায় ক্রমান্বয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ কমে গিয়ে তার স্থলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার, জনগণের সচেতনতা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ।

কৃষি বহুমুখীকরণের ফলে নতুন নতুন শস্যের উৎপাদনে কৃষিঋণের প্রবাহ বেড়েছে। কৃষির বিভিন্ন উপখাতে যেমন–মৎস্য চাষ, পশুপালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বিতরণের ফলে ঋণের বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনাজপুর জেলায় শস্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ব্যাংকঋণের বিবরণ টেবিল ৪ এ প্রদান করা হলো।

টেবিল ৪ : দিনাজপুর জেলায় সরকারি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংকের গত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিতরণের খাত	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	মন্তব্য
১.	শস্য ঋণ	১১৫৩১.৫৩	১৮৫৭৩.২৪	২১৮০১.৬৩	২২০৭৮.৪৯	২১৭৩২.২৮	সকল ব্যাংকের
২.	মৎস্য	১২৭.১৫	১৫৫.২০	৩৬৩.৮৪	৪৪৬.৪৪	৫৫১.৯৮	সকল ব্যাংকের
৩.	পশুসম্পদ	৪২০.১২	৪৬৭.১২	৮৮০.৮০	১৪৫২.২৬	১২৮৫.৮২	সকল ব্যাংকের
৪.	কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি	১৫৭.১৬	১৭৪.৭১	৫১.২১	৮৭.২৭	৩৪.৯৭	শুধু রাকাবের।
৫.	কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৬৯৪.৫০	১৮৭০.০০	২০৭৫.৮৮	২৫১০.৩৬	১৬৮০.০০	সোনালী ও রাকাবের
৬.	এসএমই	৩৫৬৩.৯০	১৪৪২.৮৭	১৭৬৫.৩১	২২০৬.০৯	১১২৮.৩৪	সোনালী ও রাকাবের
৭.	চলতি/নগদ পুঁজি	৪৮৫১.১৫	৩৭০৩.৭৬	৪১৩৩.৭৭	৪৭৫৪.৩৫	৭২৯২.৫৭	সোনালী ও রাকাবের
৮.	দারিদ্র্য বিমোচন	-	১২১.১২	৩২৫.১৬	৪৫৪.৮০	১০৫.৪৮	সকল ব্যাংকের
৯.	অন্যান্য	১৬২৮.৫৬	১৫৯৬.০৫	১৬৩১.০৯	১৮১৯.৪৩	২২৬২.০৩	সোনালী ও রাকাবের
	মোট	২৩৯৭৪.০৭	২৮১০৪.০৭	৩৩০২৮.৬৯	৩৫৮০৯.৪৯	৩৬০৭৩.৪৭	

উৎসঃ ১. *সোনালী ব্যাংক লিমিটেড*, প্রধান কার্যালয়, দিনাজপুর, তারিখঃ ৩১.০৭.২০১৪।
২. *রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)*, জোনাল কার্যালয়, (উত্তর ও দক্ষিণ জোন), দিনাজপুর. ০৭.০৭.২০১৪।

উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, দিনাজপুর জেলায় সকল ব্যাংকের বিতরণকৃত শস্য ঋণের পরিমাণ ২০১০ সালে ১১৫৩১.৫৩ লক্ষ টাকা ছিল। ২০১৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২২০৭৮.৪৯ লক্ষ টাকা হয়েছে। মৎস্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১০ সালে ১২৭.১৫ লক্ষ টাকা থেকে ২০১৪ সালে ৫৫১.৯৮ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুসম্পদ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সালে এই খাতে বিরতণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৪৫২.২৬ লক্ষ টাকা, ২০১০ সালে যার পরিমাণ ৪২০.১২ লক্ষ টাকা ছিল। কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০১০ সালে শুধু রাকাবের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৭.১৬ লক্ষ টাকা। ২০১৩ সালে কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫১০.৩৬ লক্ষ টাকা। ২০১৩ সালে এসএমই খাতে সোনালী ব্যাংক লিঃ এবং রাকাবের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২২০৬.০৯ লক্ষ টাকা। চলতি পুঁজি খাতে ২০১৩ সালে সোনালী ব্যাংক লিঃ এবং রাকাব ৪৭৫৪.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে সকল ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালে ১২১.১২ লক্ষ টাকা ছিল। এই খাতে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৪৫৪.৮০ লক্ষ টাকা হয়েছে। দিনাজপুর জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্ণিত খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণ বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অভাব অনেকটাই পূরণ করেছে। ফলে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দিনাজপুর জেলার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

কৃষি, শিল্প, সেবাখাতে নিয়োজিত জনসম্পদ

অতীতে দিনাজপুরের অর্থনীতি ছিলো মূলত কৃষিনির্ভর। শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। কালক্রমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা

তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিছু মানুষ শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। নিম্নে দিনাজপুর জেলা ও এর অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে কর্মে নিয়োজিত সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার খাতভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

দিনাজপুর জেলা ও জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে কর্মে নিয়োজিত সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের (যারা স্কুলে যায় না) জনসংখ্যার

টেবিল ৫ : খাতভিত্তিক বিভাজন

জেলা ও উপজেলার বিবরণ	কর্মে নিয়োজিত সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যা (যারা স্কুলে যায় না)			কর্মক্ষেত্র								
				কৃষি			শিল্প			সেবা		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
দিনাজপুর জেলা												
মোট	৩৩১৬৩৬	৩০২৫১১	২৯১২৫	২৪৬৮৭০	২৩২৭৬০	১৪১১০	১২৩৩৩	১০৫১৩	১৮২০	৭২৪৩৩	৫৯২৩৮	১৩১৯৫
%	১০০%	৯১.২২	৮.৭৮	৭৪.৪৪	৭০.১৯	৪.২৫	৩.৭২	৩.১৭	০.৫৫	২১.৮৪	১৭.৮৬	৩.৯৮
বিরামপুর উপজেলা												
মোট	১৯৭৭২	১৮৪২৭	১৩৪৫	১৫০৬১	১৪৫০৪	৫৫৭	৪৯১	৪১২	৭৯	৪২২০	৩৫১১	৭০৯
%	১০০%	৯৩.২০	৬.৮০	৭৬.১৭	৭৩.৩৬	২.৮২	২.৪৮	২.০৮	০.৪০	২১.৩৪	১৭.৭৬	৩.৫৯
বিরগঞ্জ উপজেলা												
মোট	৩৮০৭২	৩৫০৭৯	২৯৯৩	৩০৫২৭	২৮৮২৩	১৭০৪	৮৯৯	৮০৪	৯৫	৬৬৪৬	৫৪৫২	১১৯৪
%	১০০%	৯২.১৪	৭.৮৬	৮০.১৮	৭৫.৭১	৪.৪৮	২.৩৬	২.১১	০.২৫	১৭.৪৬	১৪.৩২	৩.১৪
বিরল উপজেলা												
মোট	৩০৫৪৬	২৮৩৫৫	২১৯১	২৪০১৭	২২৪৩৬	১৫৮১	৯০০	৮৪০	৬০	৫৬২৯	৫০৭৯	৫৫০
%	১০০%	৯২.৮৩	৭.১৭	৭৮.৬৩	৭৩.৪৫	৫.১৮	২.৯৫	২.৭৫	০.২০	১৮.৪৩	১৬.৬৩	১.৮০
বোচাগঞ্জ উপজেলা												
মোট	১৭৭৩৭	১৫০০০	২৭৩৭	১৪১৪৫	১২২৬৪	১৮৮১	৯৫২	৭২৮	২২৪	২৬৪০	২০০৮	৬৩২
%	১০০%	৮৪.৫৭	১৫.৪৩	৭৯.৭৫	৬৯.১৪	১০.৬০	৫.৩৭	৪.১০	১.২৬	১৪.৮৮	১১.৩২	৩.৫৬
চিরিরবন্দর উপজেলা												
মোট	৩১৩৮৮	২৯১১০	২২৭৮	২৪৩৯৫	২৩১২১	১২৭৪	৯২৪	৭৬৬	১৫৮	৬০৬৯	৫২২৩	৮৪৬
%	১০০%	৯২.৭৪	৭.২৬	৭৭.৭২	৭৩.৬৬	৪.০৬	২.৯৪	২.৪৪	০.৫০	১৯.৩৪	১৬.৬৪	২.৭০
ফুলবাড়ি উপজেলা												
মোট	১৯৬৫২	১৭৯৬৯	১৬৮৩	১৪২৩৫	১৩৫৩৫	৭০০	৮৪৪	৬৯৬	১৪৮	৪৫৭৩	৩৭৩৮	৮৩৫
%	১০০%	৯১.৪৪	৮.৫৬	৭২.৪৪	৬৮.৮৭	৩.৫৬	৪.২৯	৩.৫৪	০.৭৫	২৩.২৭	১৯.০২	৪.২৫
ঘোড়াঘাট উপজেলা												
মোট	১৬০৪৯	১৪৬৩১	১৪১৮	১৩০০৯	১২১৩৭	৮৭২	৪৯৫	৪৫৪	৪১	২৫৪৫	২০৪০	৫০৫
%	১০০%	৯১.১৬	৮.৮৪	৮১.০৬	৭৫.৬২	৫.৪৩	৩.০৮	২.৮৩	০.২৬	১৫.৮৬	১২.৭১	৩.১৫
হাকিমপুর উপজেলা												
মোট	৮৬১৪	৭৭৫০	৮৬৪	৬২০৯	৫৮৫৮	৩৫১	২৪৫	২২৩	২২	২১৬০	১৬৬৯	৪৯১
%	১০০%	৮৯.৯৭	১০.০৩	৭২.০৮	৬৮.০১	৪.০৭	২.৮৪	২.৫৯	০.২৬	২৫.০৮	১৯.৩৮	৫.৭০
কাহারোল উপজেলা												
মোট	১৭৮৪১	১৬১৫০	১৬৯১	১৪০৭৫	১২৯৬৭	১১০৮	৭৩০	৬২৮	১০২	৩০৩৬	২৫৫৫	৪৮১
%	১০০%	৯০.৫২	৯.৪৮	৭৮.৮৯	৭২.৬৮	৬.২১	৪.০৯	৩.৫২	০.৫৭	১৭.০২	১৪.৩২	২.৭০
খানসামা উপজেলা												
মোট	২০৫৩১	১৯২৭০	১২৬১	১৭২৩২	১৬৪০৭	৮২৫	৬১৮	৫৬৬	৫২	২৬৮১	২২৯৭	৩৮৪
%	১০০%	৯৩.৮৬	৬.১৪	৮৩.৯৩	৭৯.৯১	৪.০২	৩.০১	২.৭৬	০.২৫	১৩.০৬	১১.১৯	১.৮৭

দিনাজপুর সদর উপজেলা মোট	৪০২৩২	৩৪০১৯	৬২১৩	১৬৮৭৭	১৫৮০০	১০৭৭	২৭৯৬	২২৬০	৫৩৬	২০৫৫৯	১৫৯৫৯	৪৬০০
%	১০০%	৮৪.৫৬	১৫.৪৪	৪১.৯৫	৩৯.২৭	২.৬৮	৬.৯৫	৫.৬২	১.৩৩	৫১.১০	৩৯.৬৭	১১.৪৩
নবাবগঞ্জ উপজেলা মোট	৩০৭৭৪	২৯০০৩	১৭৭১	২৬২৯৪	২৫১৫৬	১১৩৮	১১৯২	১০৭৬	১১৬	৩২৮৮	২৭৭১	৫১৭
%	১০০%	৯৪.২৫	৫.৭৫	৮৫.৪৪	৮১.৭৪	৩.৭০	৩.৮৭	৩.৫০	০.৩৮	১০.৬৮	৯.০০	১.৬৮
পার্বতীপুর উপজেলা মোট	৪০৪২৮	৩৭৭৪৮	২৬৮০	৩০৭৯৪	২৯৭৫২	১০৪২	১২৪৭	১০৬০	১৮৭	৮৩৮৭	৬৯৩৬	১৪৫১
%	১০০%	৯৩.৩৭	৬.৬৩	৭৬.১৭	৭৩.৫৯	২.৫৮	৩.০৮	২.৬২	০.৪৬	২০.৭৫	১৭.১৬	৩.৫৯

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২, টেবিল সি-১১: পৃ. ১-৯৮।

দিনাজপুর জেলার কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের মোট জনসংখ্যা ৩৩১৬৩৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩০২৫১১ জন এবং মহিলা ২৯১২৫ জন। কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ২৪৬৮৭০ জন, শিল্পে ১২৩৩৩ জন এবং সেবায় ৭২৪৩৩ জন। কৃষিখাতে উল্লিখিত মোট জনসংখ্যার ৭৪.৪৪%, শিল্পে ৩.৭২% এবং সেবাখাতে ২১.৮৪% লোক কাজ করে। শহরাঞ্চলে কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যা কর্মে নিয়োজিত মোট জনসংখ্যার ২৪.৯৬%, শিল্পে অন্যান্য এলাকার তুলনায় সবচেয়ে বেশি ৮.৬১% এবং সেবায় ৬৬.৪৩% লোক নিয়োজিত রয়েছে। এই ৬৬.৪৩% এর মধ্যে পুরুষ ৫০.১৯% এবং নারী ১৬.২৪%। গ্রামাঞ্চলে শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। দিনাজপুর সদর উপজেলায় কৃষিতে সবচেয়ে কম ৪১.৯৫%, শিল্পে ৬.৯৫% এবং সেবাখাতে তুলামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি, ৫১.১০% মানুষ কাজ করে। এই ৫১.১০% এর মধ্যে ৩৯.৬৭% পুরুষ এবং ১১.৪৩% মহিলা। উল্লেখ্য যে, শহর অঞ্চলে সেবাখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেশি, ১৬.২৪%। নবাবগঞ্জ উপজেলায় কৃষিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক, ৮৫.৪৪% লোক কাজ করে। শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যার বিচারে দিনাজপুর শহরের পরের অবস্থানে রয়েছে ফুলবাড়ী উপজেলা। এই উপজেলায় শিল্পে ৪.২৯% এবং সেবাখাতে ২৩.২৭% লোক কাজ করে।

৯. আবাসনঃ গৃহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

২০১১ সালের আদমশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ২৯৯০১২৮ জনের মধ্যে ২৯৮৭৬২৪ জন পারিবারিক জীবন যাপন করে। ভাসমান মানুষের সংখ্যা ২৫০৪ জন। প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১.৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ১৬০৪৯ টি, মোট জনসংখ্যা ৬৬৮৬১ জন। তন্মধ্যে ৩৩০৩০ জন পুরুষ এবং ৩৩৮৩১ জন নারী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ৪৯৮৬১ জন সাঁওতাল, ৪৫৬৬ জন ওঁরাও এবং ১২৪৩৪ জন অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। পূর্বে এ সকল নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব অর্থনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিলো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন কারণে তারা সেগুলো হারিয়ে ফেলছে।

দিনাজপুর জেলার মোট গৃহের সংখ্যা ৭১৩২৫৫ টি। এর মধ্যে পাকা বাড়ি ৫.৫%, সেমি-পাকা বাড়ি ২৩.৪%, কাঁচা ঘরবাড়ি ৬৬.০%, এবং ঝুপড়ি ৫.১%। সদর উপজেলায় পাকা বাড়ি ১৪.৯%, সেমিপাকা বাড়ি ৩২.০%, কাঁচা ঘরবাড়ি ৪৫.৩% এবং ঝুপড়ি ৭.৯%। অন্যান্য, উপজেলার মধ্যে ফুলবাড়ী উপজেলার ঘরবাড়ির অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত। ঘোড়াঘাট উপজেলায় ঝুপড়ির সংখ্যা

বেশি। নিচে টেবিল ৬ এ দিনাজপুর জেলা ও জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে বাড়িঘরের কাঠামোগত অবস্থা ও টয়লেট সুবিধার পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ৬ : দিনাজপুর জেলা ও জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে বাড়িঘরের কাঠামোগত অবস্থা ও টয়লেট সুবিধা

দিনাজপুর জেলা ও অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহ	পরিবারের সংখ্যা	বাড়িঘরের ধরন/ কাঠামো (%)				টয়লেট সুবিধা (%)			
		পাকা	সেমি পাকা	কাঁচা ঘরবাড়ি	ঝুপড়ি	পরিচ্ছন্ন টয়লেট (পানিরুদ্ধ)	পরিচ্ছন্ন টয়লেট (পানিরুদ্ধ নয়)	অপরিচ্ছন্ন টয়লেট	টয়লেট বিহিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
দিনাজপুর জেলা মোট	৭১৩২৫৫	৫.৫	২৩.৪	৬৬.০	৫.১	৩২.৪	১৫.৬	২৮.৭	২৩.৩
বিরামপুর উপজেলা মোট	৪১৯৮৮	৩.১	২৮.২	৬২.৭	৬.১	৩৬.৫	২২.৩	২৮.৭	১২.৪
বিরগঞ্জ উপজেলা মোট	৭৩৭২৩	২.৯	১৬.৪	৭৫.৬	৫.২	৩০.৩	১৬.৬	৩২.০	২১.১
বিরল উপজেলা মোট	৬১৩৩৭	৩.৫	২৩.৭	৬৭.৫	৫.৩	২৮.৩	৮.২	২১.৮	৪১.৭
বোচাগঞ্জ উপজেলা মোট	৩৯১৫৯	২.৯	২৪.৪	৭০.৬	২.০	৪৬.৩	১২.৪	১৬.৯	২৪.৩
চিরিরবন্দর উপজেলা মোট	৬৮৩১৬	৫.১	২১.৮	৬৯.১	৪.০	১৯.০	১৫.৬	৪১.৬	২৩.৮
ফুলবাড়ী উপজেলা মোট	৪৩০০২	৫.০	২৯.০	৬০.৯	৫.১	৪০.৩	১৩.৩	২৬.৮	১৯.৬
ঘোড়াঘাট উপজেলা মোট	৩০০২০	১.৬	১৮.২	৭২.০	৮.২	৪০.৩	১৮.৭	৩০.০	১১.১
হাকিমপুর উপজেলা মোট	২২৮৪৪	৩.৫	২২.৬	৭০.৩	৩.৬	৩৭.১	২৩.৬	২৭.৯	১১.৪
কাহারোল উপজেলা মোট	৩৬৭২০	৪.১	১৮.৮	৭২.৩	৪.৮	৩২.৫	১২.৪	৩১.৯	২৩.২
খানসামা উপজেলা মোট	৩৯৩৯২	২.৭	১৩.৪	৭৯.৩	৪.৫	৩২.৫	১৫.৪	৩৬.৩	১৫.৭
দিনাজপুর সদর উপজেলা মোট	১১০৪৮৩	১৪.৯	৩২.০	৪৫.৩	৭.৯	৩৮.১	১৬.১	২৩.০	২২.৮
নবাবগঞ্জ উপজেলা মোট	৫৭৭৫৩	২.১	২২.৫	৭০.৭	৪.৭	৩৩.৫	১৮.৯	২৭.২	২০.৪
পার্বতীপুর উপজেলা মোট	৮৮৫১৮	৬.৩	২২.৯	৬৭.৩	৩.৫	২৩.৩	১৪.৫	৩০.২	৩২.০

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারি ও গৃহগণনা - ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২, টেবিল সি-১৪, পৃ. ১-৯৮।

উন্নত টয়লেট সুবিধা রয়েছে এরূপ গৃহের সংখ্যা ৩২.৪%, তেমন উন্নত নয় তবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট আছে ১৫.৬% গৃহে এবং নিম্নমানের টয়লেটের সংখ্যা ২৮.৭%। কোন টয়লেট সুবিধা নাই এরূপ গৃহের সংখ্যা ২৩.৩%। বিরল উপজেলায় টয়লেট সুবিধাহীন গৃহের সংখ্যা বেশি (৪১.৭%)। উন্নত টয়লেট সুবিধার দিক থেকে এগিয়ে আছে বোচাগঞ্জ উপজেলা (৪৬.৩%)। দিনাজপুর জেলায় খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১.৪% পরিবার ট্যাপের পানি ব্যবহার করে। ৯৬.৫% পরিবার টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে এবং ২.১% পরিবার অন্যান্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করে। ৩৯.৪% পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।

১০. দিনমজুরসহ বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি

কৃষির ভরা মৌসুমে একজন ক্ষেতমজুর দেনিক ৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পায়। একজন নারী শ্রমিক ৩০০.০০ টাকা মজুরি পায়। মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে শ্রমের চাহিদা কম হওয়ায় মজুরি কমে যায়। তখন একজন নারী শ্রমিককে মাত্র ১৫০.০০ টাকা থেকে ২০০.০০ টাকা এবং পুরুষ শ্রমিককে ২৫০.০০ টাকা থেকে ৩০০.০০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে হয়। দিনাজপুর জেলায় বিশেষ করে সদর উপজেলায় চালকলের আধিক্য রয়েছে। এসব চালকলের শ্রমিকেরা মাসে ৩৫০০.০০ টাকা থেকে ৪০০০.০০ টাকা মজুরি পেয়ে থাকেন। নারী শ্রমিকের আয় সে তুলনায় অনেক কম হয়। তাদের গড় আয় মাসে ১৫০০.০০ টাকা থেকে ২০০০.০০ টাকা মাত্র (টেবিল ৭ দেখুন)।

টেবিল ৭ : দিনাজপুর সদর উপজেলায় বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকের দৈনিক/ মাসিক মজুরি।

শ্রমিকের ধরন	নারী/পুরুষ	দৈনিক মজুরি/আয়	মাসিক মজুরি/আয়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়	মন্তব্য
খেত মজুর	পুরুষ	৫০০.০০		২৫০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	
	নারী	৩০০.০০		১৫০.০০	৩০০.০০	২২৫.০০	
চালকল শ্রমিক	পুরুষ		৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০.০০	৩৭৫০.০০	
	নারী		২০০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	১৭৫০.০০	
হোটেল (আবাসিক)	--------		৩০০০.০০	২৫০০.০০	৩০০০.০০	২৭৫০.০০	
হোটেল (খাবার)	--------		৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০.০০	৩৭৫০.০০	
নির্মাণ শ্রমিক	দক্ষ (পুরুষ)	৪০০.০০		৩৫০.০০	৪০০.০০	৩৭৫.০০	
	আধাদক্ষ (পুরুষ)	২৫০.০০		২০০.০০	২৫০.০০	২২৫.০০	
	নারী	৪০০.০০		৩০০.০০	৪০০.০০	৩৫০.০০	
কাঠমিস্ত্রি	দক্ষ		১২০০০.০০	১০০০০.০০	১২০০০.০০	১১০০০.০০	
	আধাদক্ষ		৮০০০.০০	৬০০০.০০	৮০০০.০০	৭০০০.০০	
কারখানা শ্রমিক (ক্ষুদ্র)	-------		৩০০০.০০	২৮০০.০০	৩০০০.০০	২৯০০.০০	
কারখানা শ্রমিক (মাঝারি)	--------		৪৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৪২৫০.০০	
দোকানের বিক্রয়কর্মী	পুরুষ		৫৫০০.০০	৫০০০.০০	৫৫০০.০০	৫২৫০.০০	
	নারী		৩৫০০.০০	৩০০০.০০	৩৫০০.০০	৩২৫০.০০	
ক্লিনিক	পুরুষ		৫০০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০	৪৫০০.০০	
	নারী		৫৫০০.০০	৫০০০.০০	৫৫০০.০০	৫২৫০.০০	
পাহারাদার	--------		৫০০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০	৪৫০০.০০	
রিকসা চালক	--------	৩০০.০০		২০০.০০	৩০০.০০	২৫০.০০	
অটো চালক	--------	৫০০.০০		৪০০.০০	৫০০.০০	৪৫০.০০	
গৃহকর্মী	--------		১৫০০.০০	১০০০.০০	১৫০০.০০	১২৫০.০০	
মটর শ্রমিক	হেলপার		৮০০০.০০	৭০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	
	ড্রাইভার		১২০০০.০	১০০০০.০০	১২০০০.০০	১১০০০.০০	

উৎসঃ ২৭-৩০ জুন ২০১৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারী দ্বারা সংগৃহীত।

আবাসিক হোটেল শ্রমিকেরা মাসে ৩০০০.০০ টাকা মজুরি পেয়ে থাকে। এ ধরনের শ্রমিকেরা দৈনিক ৩ (তিন) শিফটে কাজ করেন। এক শিফটে কাজ করে (০৮ ঘন্টায়) তারা উক্ত মজুরি পান। খাবার হোটেলে সারাদিন কাজ করে খেয়েদেয়ে একজন শ্রমিক মাসে ৩৫০০.০০ টাকা থেকে ৪০০০.০০ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষ পুরুষ শ্রমিক দেনিক ৪০০.০০ টাকা, আধাদক্ষ শ্রমিক ২৫০.০০ টাকা এবং নারী শ্রমিক (সাধারণত ঢালাইয়ের কাজে) ৪০০.০০ টাকা দৈনিক মজুরি লাভ করেন। একই বাসায় থাকা- খাওয়ার বিনিময়ে গৃহকর্মীর কাজ করে একজন নারী মাসে ১০০০.০০ টাকা থেকে ১৫০০.০০ টাকা মজুরি পান। তবে একাধিক বাসায় বা মেসে কাজ করে একজন গৃহকর্মী ২৫০০.০০ টাকা থেকে ৩৫০০.০০ টাকা উপার্জন করেন। ক্ষেত্র ভেদে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরি এক নয়। একই কাজের ক্ষেত্রে তাদের মজুরির পার্থক্য রয়েছে । শ্রমের পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন।

১১. দিনাজপুর জেলার উল্লেখযোগ্য কিছু পণ্যদ্রব্যের দাম

কর্মসংস্থান, উৎপাদন, আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য কয়েকটি জরুরি শর্ত।

ভোগের জন্য পর্যাপ্ত দ্রব্য এবং সেবার সংস্থান করতে না পারলে জীবনযাত্রার মান কমে যায়। তাই দ্রব্যমূল্য অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

আবার উৎপাদকের জন্য দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা এবং তার যৌক্তিক ক্রমবৃদ্ধি উৎসাহদায়ক বটে। বাস্তবে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী। নিচের ৮ নম্বর টেবিলে ১৯৯০-২০১৪ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার উৎপাদিত কয়েকটি ফসলের গড় দাম উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ৮ : দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ফসলের বার্ষিক গড় মূল্য পরিস্থিতি (১৯৯০-২০১৪)

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	বছর (প্রতি কুইন্টাল/টাকায়)					
		১৯৯০	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৪
১.	ধান-আমন-মোটা	৬১০.০০	৭৯০.০০	৭২০.০০	৯৭৫.০০	১৮২০.০০	১৯৭৫.০০
২.	ধান-আমন-মাঝারি	৬৪০.০০	৮৫৫.০০	৭৫০.০০	১০২০.০০	১৯৮৫.০০	২২০৫.০০
৩.	ধান-আমন-সরু	৭৫৫.০০	৯৭৫.০০	৮৩০.০০	১১৭০.০০	২১৪৫.০০	২৫৮০.০০
৪.	ধান-বোরো-মোটা	৪১৫.০০	৬১০.০০	৫৯৪.০০	৮৭০.০০	১৭৬৫.০০	১৬৩৬.০০
৫.	ধান-বোরো-মাঝারি	৪৪০.০০	৫৮০.০০	৬৭০.০০	৯০৫.০০	১৭৯৫.০০	১৮৬০.০০
৬.	গম	৭০৫.০০	৮৫০.০০	৮৬০.০০	১২৬০.০০	১৯২৫.০০	২২৪৫.০০
৭.	সরিষা	১৬০০.০০	১৯১৫.০০	১৬৩০.০০	২১১৫.০০	৩৮৯০.০০	৩৬৮৫.০০
৮.	পিঁয়াজ	৯২৫.০০	১০৩০.০০	১১০০.০০	১৫৮৫.০০	২২৪০.০০	২২৪০.০০
৯.	রসুন	১৮৬৫.০০	২৯৭৫.০০	২৮৯৫.০০	৩৫৪০.০০	১১৭৮৫.০০	৫৬৬০.০০
১০.	শুকনা মরিচ	৪৩৮০.০০	৭৭৩৫.০০	৪৭৭৮.০০	৪৪৬৫.০০	১০৬৬০.০০	১৫৪০০.০০
১১.	দেশি মুরগি	৪৫৮০.০০	৬০১৫.০০	৭৬৩০.০০	১০১৩৫.০০	১৮০৬৫.০০	২৫৩০০.০০
১২.	গরুর মাংস	৪১৫০.০০	৪৭০০.০০	৬৫০০.০০	১০০০০.০০	২৩৫০০.০০	২৫০০০.০০
১৩.	কলাই-মসুর	১৬১৫.০০	২৩৯৫.০০	২১৬৫.০০	-	-	-
১৪.	কলাই-ছোলা	১৬৭০.০০	২০৯৫.০০	১৮১৫.০০	-	-	-
১৫.	আলু-কার্ডিনাল	৪৭৫.০০	৫২০.০০	৫৮৫.০০	৫৬০.০০	১১৪৫.০০	৯৪২.০০
১৬.	আলু-দেশি গুটি	৫১০.০০	৫৮০.০০	৬৩০.০০	৫৭৫.০০	১৩৮৫.০০	১২৮৫.০০
১৭.	বেগুন	৪২৫.০০	৬৪৫.০০	৭১০.০০	৮৮৫.০০	১৩৭০.০০	১৬১৭.০০
১৮.	পটল	৬৯৮.০০	৬১৫.০০	৬৫০.০০	১১৫৫.০০	১৫২০.০০	২২৯৯.০০
১৯.	করল্যা	৫৭৪.০০	১১৩০.০০	১১৩৫.০০	১০৪০.০০	১৯৪০.০০	২২৫৫.০০
২০.	টমেটো	৬৮৮.০০	৭৩০.০০	৬৮০.০০	৭৮০.০০	৮৬৫.০০	১৪৯০.০০
২১.	ফুলকপি	৩৮৪.০০	৮২৫.০০	৭৪০.০০	৩৭৫.০০	৬০০.০০	১৩১০.০০
২২.	বাঁধাকপি	১৬৬.০০	৩৯০.০০	৪০৫.০০	১০৫.০০	২৯৫.০০	৬৩৫.০০
২৩.	ভূট্টা	-	-	-	৮৬৭.০০	১৫৫০.০০	১৫৭০.০০
২৪.	চিনিগুড়া ধান	৮৪০.০০	১১৭৫.০০	১৬৪২.০০	১৭১০.০০	৩২৭০.০০	৩৬৪০.০০
২৫.	কাটারী ধান	৮২৫.০০	১০৬৫.০০	১৩০০.০০	১৪৩৫.০০	২৮৩০.০০	২৯৯০.০০

উৎস: *জেলা বাজার কর্মকর্তা*, দিনাজপুর, তারিখ: ২০. ০৬. ২০১৪ খ্রি.

১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালে ধানের দাম বেড়েছে তিন গুন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত গমের দামও তিনগুন বেড়েছে। ১৯৯০ সালে প্রতি কুইন্টাল (১০০ কেজি) সরিষার দাম ১৬০০.০০ টাকা ছিল। ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৯০.০০ টাকা হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রতি কুইন্টাল পিঁয়াজের দাম ৯২৫.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ২২৪০.০০ টাকা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে দেশি মুরগি ও গরুর মাংসের দাম, ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে দাম বেড়েছে ৫ গুণ।

১২. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন

অতীতে দিনাজপুরের রাস্তাঘাট তেমন উন্নত ছিলো না। স্বাধীনতার পর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ অঞ্চলেও ক্রমান্বয়ে রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে

এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবকাঠামো। দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় যমুনা সেতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার সাথে দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে দিনাজপুরের বিভিন্ন উপজেলা এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে এ জেলার পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিম্নে দিনাজপুর জেলার সড়ক ও রেলপথের বিবরণ টেবিল ৯ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

টেবিল ৯ : যোগাযোগ ব্যবস্থা: সড়ক ও রেলপথ

বিবরণ	কিলোমিটার	মন্তব্য
মোট পাকা রাস্তা	৬৯১ কি: মি:	জুন ২০১৪ পর্যন্ত
আধাপাকা রাস্তা	২৯৫ কি: মি:	
কাঁচা রাস্তা	৪৭২০ কি: মি:	
রেলপথ	১৪২.০২ কি: মি:	
রেলস্টেশন	১৮টি	
সওজ, দিনাজপুরের অধীন সড়ক ও সেতু		
মোট পাকা সড়কের পরিমাণ	৪৪১.৭৯১ কি:মি:	
মহাসড়কের উপর মোট সেতু	৬৫টি	
সবচেয়ে বড় সড়ক সেতু (দৈর্ঘ্য)	১৫৪.২০ মিটার	

উৎস: *dcdinajpur.gov.bd*, Government Website (accessed on 21.06.2014).

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। ক্রমান্বয়ে সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক অবকাঠামোর ভিত্তিও গড়ে উঠেছে। ব্যানবেইজ এর ২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭৪১টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৯টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩২টি এবং স্কুল ও কলেজ (স্কুল শাখা) এর সংখ্যা ২০টি, সর্বমোট ৬৬১টি। বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থাৎ স্কুল এন্ড কলেজ পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত কলেজের সংখ্যা ১১০টি। দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত মাদরাসার সংখ্যা ৩০৮টি।[১১] বর্তমানে দিনাজপুরে ১টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১টি আইন মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও ১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের অবদানের ফলে শিক্ষার হার ও গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৩টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ১০৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রসহ ২৮টি বেসরকারি ক্লিনিক কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ সালে দিনাজপুর জেলায় শিক্ষার হার ৪৫.৭% ছিলো। ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৪% হয়েছে। নিচে টেবিল ১৪ তে শিক্ষা, নগরায়নের হার উল্লেখ করা হলো। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার হার ৪০.০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.১% হয়েছে। নগরায়নের হার ২০০১ সালে ১৪.০৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ১৫.১৭% হয়েছে (টেবিল ১০ দেখুন)।

[১১] পরিশিষ্ট ১, ২, ৩, ও ৪ এ দিনাজপুর জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ১০ : জনসংখ্যা, শিক্ষা ও নগরায়নের হার

বিষয়	বাংলাদেশ	রংপুর বিভাগ	দিনাজপুর জেলা	
			২০১১	২০০১
মোট জনসংখ্যা	১৪৪০৪৩৬৯৭	১৫৭৮৭৭৫৮	২৯৯০১২৮	২৬৪২৮৫০
শহর	২৭৪৬৮৭৮৯	১৬০৩২২২	৩৯৩৯২০	২৯৭৫৮২
শহরতলী	৬০৯৪৩৯৪	৫০৫৮৪৯	৫৯৭৭৯	৭৩২৯২
গ্রাম	১১০৪৮০৫১৪	১৩৬৭৮৬৮৭	২৫৩৬৪২৯	২২৭১৯৮৬
বৃদ্ধির হার	১.৪৭	১.৩	১.২২	১.৫৮
জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৭৬	৯৭৫	৮৬৮	৭৬৯
নগরায়নের হার	২৩.৩০	১৩.৩৬	১৫.১৭	১৪.০৩
শিক্ষার হার	৫১.৮	৪৭.২	৫২.৪	৪৫.৭
নারী	৪৯.৪	৪৩.৮	৪৯.১	৪০.০
পুরুষ	৫৪.১	৫০.৬	৫৫.৭	৫১.০
স্কুলে যাওয়ার হার (৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের)	৫২.৭	৫৫.০	৫৬.৭	৪৮.৮
নারী	৫০.৮	৫২.৫	৫৪.৩	৪৫.৬
পুরুষ	৫৪.৬	৫৭.৬	৫৯.১	৫১.৮
জনসংখ্যা (সমন্বয়কৃত)	১৪৯৭৭২৩৬৪	১৬৪১২২৮৭	৩১০৯৬২৮	২৭৬৬০০০

উৎসঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারি ও গৃহগণনা - ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২, পৃ. ১০।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কলেরার মত রোগের প্রকোপ ও ভয়াবহতা কমে গেছে এবং বর্তমানে এসকল আপদ থেকে মানুষের অনেকটা মুক্তি ঘটেছে বলা যায়। সাম্প্রতিককালে নিপা ভাইরাস, বার্ড ফ্লু, এ্যানথ্রাক্সে প্রাদুর্ভাব এবং এইডস ভাইরাসের উদ্ভবের কারণে নতুন করে স্বাস্থ্য রক্ষার ঝুঁকি বেড়েছে। তবে এগুলোর বিপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এগুলোর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৩. কৃষি, পরিবেশ, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক হলেও কৃষিক্ষেত্রের এই পরিবর্তন পল্লি-উন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। একদিকে কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি, অন্যদিকে কৃষিপণ্যের দামের অস্বাভাবিক উঠানামার কারণে বিশেষ করে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের বিপদ দেখা দিয়েছে। কৃষিপণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা (যেমন পাট, রসুনের দাম) উৎপাদন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে। পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদনের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায় (বিশেষ করে শবজি, ফলমূল ও মাছ)। এছাড়া, মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কৃষকদের পণ্যমূল্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উপরন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা বাড়ে এবং নিঃস্ব অসহায় অবস্থার কারণে তারা আবার পুনরুৎপাদনে যেতে পারে না।

বিগত সময়ে উফশি চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল বৃদ্ধির জন্য নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, অভাবনীয় পানি দূষণের কারণে মাছের উৎপাদন হ্রাসসহ জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ব্যাঙ, কেঁচোসহ অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ইট ভাটার জ্বালানি সরবরাহের জন্য নির্বিচারে বড় বড় বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

কোন কোন এলাকায় পানির প্রাপ্যতা কমে গেছে। শুষ্ক মৌসুমে রবিশস্য চাষে সমস্যা হচ্ছে। মাটিতে

রস থাকছে না। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েলে পানি উঠতে চায় না। নদীগুলোতে আগের মতো পানি নেই। নদীকে ঘিরে নদীতীরবর্তী মানুষের যে জীবনযাত্রা তার স্বরূপ বদলে গেছে। হতদরিদ্র নারীদেরকে প্রকৃতির কাছ থেকে জীবনের নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পানিসম্পদের ব্যবহার, মানববসতি ও স্থানান্তর প্রক্রিয়া, জ্বালানি ও যোগাযোগ দারুণভাবে বিঘ্নিত হলে নারীর অসহায়ত্ব বাড়বে। মাটি, পানি, বায়ু দূষণ ও মরুকরণের ফলে প্রাকৃতিক জ্বালানি ও শস্য সংগ্রহে সমস্যা দেখা দিবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মারাত্মক অভিঘাতে নারী ও শিশুরাই আগে এবং অধিকমাত্রায় দুর্ভোগের স্বীকার হবে।

সমাজজীবনে উন্নয়নের মিশ্র প্রভাব উন্নয়নের স্বরূপ নিয়ে নতুন করে ভাববার অবকাশ তৈরি করেছে। আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কতগুলো সূচকে ধনাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আবার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কয়েকটি সামাজিক সূচকের অবনতি লক্ষ করা যায়। গত কয়েক দশকে এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বিয়ে রেজিস্ট্রি, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি সূচকে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাদকাসক্তি, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং- এগুলোর সংঘটন কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক মাত্রায় রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হয়। নারীদের পরিবার প্রতিপালনে নিবেদিত থাকতে হয়। অথচ, পারিবারিক সম্পত্তিতে, ব্যাংক হিসাবে, ফার্মে তাদের মালিকানা কম। ফলে যে কোন বিপর্যয়ের মুখে তারা নিজেদেরকে অধিক অসহায় মনে করেন।

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের বেতনের মধ্যে বৈষম্য কমেনি, একজন পুরষ শ্রমিক দৈনিক গড়ে ৩৭৫.০০ (তিনশত পঁচাত্তর) টাকা মজুরি পেলেও একজন নারী শ্রমিক পায় ২২৫.০০ (দুইশত পঁচিশ) টাকা। ফসল বোনার সময়, ধানের চারা রোপনের সময়, ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের সময় শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায় এবং মজুরি ৫০% থেকে ১০০% বৃদ্ধি পায়। অন্য সময়ে শ্রমের চাহিদা কমে যায়, কৃষি মজুরিও কমে। অনেকক্ষেত্রে, পুরুষদের সাথে নারী এবং কখনোবা শিশুদেরও অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, যেমন- ইটের ভাটায়, বাড়ি ও স্থাপত্য নির্মাণে, ইট-পাথর ভাঙ্গা, রাস্তা মেরামত ইত্যাদি কাজে শ্রম দিতে হয়।

শিক্ষা, সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগের উন্নতির ফলে জীবন, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে এ অঞ্চলের মানুষের জ্ঞান বেড়েছে এবং সমাজজীবনে পরিবর্তন ও উন্নয়নের সূচনা হয়েছে একথা বলা যায়। কিন্তু সেই অর্জিত জ্ঞান তাদের মনোভাব ও জীবনচর্চার ক্ষেত্রে আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। সেনিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সচেতনা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ রোধের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী এ অঞ্চলের, বিশেষ করে গ্রামীণ আপামর জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ও জীবনচর্চায় আশানুরূপ উন্নয়ন না ঘটলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল অর্জন সম্ভব হবে না।

দিনাজপুরে অনধিক ১২ (বার) টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ সব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৪% এর বেশি। ক্ষুদ্র (সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডারী, মালপাহাড়ী প্রভৃতি) জনগোষ্ঠীর উপর চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিরূপ প্রভাব লক্ষ করা যায়। উন্নয়নের চলমান এই পুঁজিবাদি প্রক্রিয়াটি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে আপন করে নিতে পারে নাই বরং দূরে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র

নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সবকিছু যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। তাদের নিজস্ব একান্ত আপন ভূবনটিতে তারা যেন আর বিচরণ করছে না। মানব বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে হলেও এ সকল জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

দিনাজপুরে এখনো অনেক উপজেলায় প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, সেতু এবং বিদ্যুৎ-এর অভাব রয়েছে। কোন কোন ইউনিয়নে পাকা রাস্তা নেই। হাট-বাজারসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন হলে এসকল এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে শিক্ষিতের হার, বিদেশে চাকরি করার হার একেবারে কম।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে রাজশাহীর ন্যায় রংপুর সম্প্রতি বিভাগে উন্নীত হওয়ায় এখানে নতুন করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দিনাজপুরের তুলনায় রংপুরে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। রাজশাহীকে অনেকে শিক্ষা ও শান্তির নগরি বলে থাকেন। এ অঞ্চলটি উদ্যান, গবাদি পশুর উন্নয়ন ও মাছ চাষে অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বগুড়ার যোগাযোগ অবকাঠামো বেশ সমৃদ্ধ। দিনাজপুরের তুলনায় বগুড়া শিল্পক্ষেত্রে অনেক উন্নত। এসকল বিচারে উন্নয়নে দিনাজপুরের অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয়।

১৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

দিনাজপুর অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলের উৎপাদিত ফলমূল কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে জ্যাম্, জেলি, জূস্সহ বেশ কিছু ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করা যায়। দিনাজপুরে পর্যটন শিল্প বিকাশের এবং উন্নয়নের আছে যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা। দিনাজপুর রাজবাড়ি, ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ প্রভৃতি প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনগুলিকে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরি। কান্তজিউ মন্দির ও রামসাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও স্বপ্নপুরীর মত আকর্ষণীয় বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। দিনাজপুর অঞ্চলে বেশকিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অনুন্নত ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় টিকে আছে। যেমন- চিড়াকুটা (ধান থেকে চিড়া তৈরি করা), মৃৎশিল্প, তাঁত, বাঁশ ও বেত শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কৃৎকৌশলগত উন্নয়নের মাধ্যমে লোকপণ্যগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করে উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা যায়।

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প প্রধান খনিজ সম্পদ। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬.৫ লক্ষ মে. টন। এর উৎপাদন থেকে সুলভ মূল্যে উন্নতমানের পাথরের সংস্থান করা যাবে। এই খনিতে মজুদ পাথরের চূর্ণ (স্টোন ডাস্ট) দেশের সিমেন্ট শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে প্রাপ্ত কয়লা তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটবে। প্রকল্প দুটিতে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এগুলো বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক হবে।

দিনাজপুরে করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবাসহ ১৯ (উনিশ) টি নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নদীপথের মোট দৈর্ঘ্য ৭২৪ কি: মি:। পূর্বে এসকল নদীকে কেন্দ্র করে একটি নদীভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় সেই ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এই নদীগুলো খননের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সেচের পানির সংস্থান করা যেতে পারে। তাতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। দিনাজপুর সদর উপজেলায় কয়েকটি বড় দিঘি (সুখসাগর, আনন্দ সাগর, মাতাসাগর) রয়েছে। এগুলোর প্রকৃত সীমানা এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য রক্ষা করা প্রয়োজন। দিনাজপুর বড়মাঠ এই এলাকার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর বিস্তৃত পরিসর ও পরিবেশ সংরক্ষণে দিনাজপুরবাসীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

১৫. সুপারিশসমূহ

(ক) নিরাপদ কৃষি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাতে ভূ-গর্ভস্থ পানি কম ব্যবহৃত হয়। এজন্য ভূট্টা, আলু, সরিষা ও মসলা জাতীয় ফসল বেশি উৎপাদন করতে হবে। কোন এলাকা কোন শস্য উৎপাদনের উপযোগী তা নির্ধারণ করে বিশেষ শস্য অঞ্চল গঠন করতে হবে। দিনাজপুরের উন্নয়নে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অধিক মূল্যবিশিষ্ট শস্যের (এইচভিসি) উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কোন জমি অপরিকল্পিতভাবে বা অকর্ষিতভাবে ফেলে রাখতে দেয়া যাবে না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষির আধুনিকায়ন, মৌসুমী ফল ও সবজি (আম, লিচু, কাঁঠাল ও টমেটো) সংরক্ষণ ও ফলের জুস তৈরির কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

(খ) আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের লক্ষ্যে দিনাজপুরকেন্দ্রীক পরিকল্পিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। শিল্প উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। দিনাজপুরের শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উন্নয়ন ব্যাংকের শাখা স্থাপন, বেসরকারি ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধিকরণ এবং লীজ ফাইনান্সিং প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব। দিনাজপুরের বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প-কারখানা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেতাবগঞ্জ চিনিকলের আধুনি-কায়ন, পুনর্বাসন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে লাভজনকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলের সকল জেলার রাস্তাঘাট, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। বৃহত্তর দিনাজপুর মহাসড়ককে ৪ লেনবিশিষ্ট করে রংপুর-বগুড়া-সিরাজগঞ্জ-ঢাকার সাথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সৃষ্টি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় হ্রাসসহ স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে ঋণমুখী কার্যক্রম পরিচালনার ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, শিল্প ও কর্মসংস্থানমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার ও সংরক্ষণ করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পর্যটন শিল্পের বিকাশে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(চ) বিরল ও বাংলাহিলি স্থলবন্দরের আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি (ভারত, ভূটান ও নেপাল) বাণিজ্য বৃদ্ধি করা যায়।

(ছ) দিনাজপুরের মহারাজা ও জনগণের খননকৃত দিঘি ও পুকুরগুলিকে সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

১৬. উপসংহার

কোন অঞ্চল বা সমাজের উন্নয়নের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে পরিণত হয় সেই অঞ্চলে বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। অর্থাৎ, উন্নয়ন সূচিত হয় সমাজের অভ্যন্তর থেকেই নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়, বাইরে থেকে নয়। বহির্জগতের যত উপকরণ–তার যোগ উন্নয়নকে তরান্বিত করে মাত্র– উন্নয়নকে সূচিত করতে পারে না। দিনাজপুরের উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির

কার্যকর ও সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা শ্রেণিকে শিল্পের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের বেকারত্ব দূর করতে হবে। দিনাজপুরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করা সম্ভব। জনগণের মনে, চিন্তায় ও কর্মে উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিতে পারলে দিনাজপুরের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আলী, মেহ্‌রাব। দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র, ৫ম খন্ড । দিনাজপুর: দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প, ২০০২।

আলম, এ. এইচ. এম মাহবুবুল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা। ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরি, ১৯৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২।

মুরশিদ, গোলাম। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

মনিরুজ্জামান, ড. মুহম্মদ। দিনাজপুরের ইতিহাস। ঢাকা: গতিধারা, এপ্রিল ২০১০।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোঃ। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৬।

রায়, ধনঞ্জয়। বিশ শতকের দিনাজপুর: মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন। কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৭।

রায়, নিখিলনাথ। মুর্শিদাবাদ কাহিনী। কলকাতা: পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮।

রায়, সুধেন্দ্র নাথ। শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ ও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, "দিনাজপুর জেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি"। খামারবাড়ি, দিনাজপুর। তারিখঃ ১৫ মে ২০১৪।

সিদ্দিকী, আশরাফ (সম্পা.)। দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ার্স। ঢাকা: বিজি প্রেস, ১৯৭২।

GoB, Ministry of Education. *Bangladesh Education Statistics 2012*. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka. December 2013.

Mahajan, V. D. *India Since 1526*. Calcutta: S. Chand & Co., 1969.

Strong, F.W. *Dinajpur Gazetteers*. Allahabad: Pioneer Press, 1912.

Thirlwal, A. P. *Growth and Development*. 3rd edn. London: Macmillan, 1986.

Todaro, M. P. *Economic Development in the Third World*. New York and London: Longman Inc., 1985.

www.dcdinajpur.gov.bd. Government Website (accessed on 21.06.2014).